কলিকাতা।
১২, ১৩ গোপালচন্দ্র নিয়োগীর লেন,
উদ্বোধন কার্য্যালয় হইতে
ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

"প্রবাহ"

উচ্চশ্রেণীর কাব্যগ্রন্থ—

প্রণেত্রী—শ্রীসরলাবালা দাসী

প্রাপ্তিস্থান—এস, সি, মজুমদার
১২১নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

কলিকাতা।
৬৪।১, ৬৪।২ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট্,
লক্ষ্মীপ্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে
শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ
কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

ভূমিকা।

পূজ্যপাদাচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দের অলোকসামান্য ত্যাগ ও চরিত্রবলে মুগ্ধ হইয়া তৎপ্রদর্শিত "আত্মনঃ মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ" সর্ব্বস্বত্যাগরূপ পন্থার অনুসরণ করতঃ পাশ্চাত্যের যে সকল মহাপ্রাণা রমণী দুঃখদারিদ্র্যপীড়িত ভারতের কল্যাণে নিজ জীবন নিয়োজিত করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, ভগিনী নিবেদিতা তাঁহাদিগের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ আসন অধিকার করিয়াছিলেন, একথা বলিলেও এক হিসাবে অত্যুক্তি হয় না। ঐ ব্রতাবলম্বন করিয়া ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে শীত ঋতুর অবসানে তিনি কলিকাতায় পদার্পণ করেন এবং ১৯১১ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসের ত্রয়োদশ দিবসে ইহসংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া শ্রীভগবানের পরমধামে উপনীতা হয়েন। ঐ ত্রয়োদশ বর্ষ তিনি যে কি ভাবে অতিবাহিত করিয়া-

ছিলেন—কি অপূর্ব্ব একনিষ্ঠা, অনন্ত অধ্যবসায় ও তন্ময় ধ্যানে রত থাকিয়া তিনি সর্ব্বদা লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন সে কথা সাধারণে অবগত নহে। নিবেদিতাকে হারাইয়াই সে কথা জানিবার জন্য এখন সকলের প্রাণে একটা প্রবল বাসনা উপস্থিত হইয়াছে।

ঐ বিষয়টি জানিতে হইলে কিন্তু আমাদিগকে নিবেদিতার বাহ্য-জীবন-যবনিকার অন্তরালে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। লোকনয়নের সম্মুখে অনুষ্ঠিত তাঁহার বড় বড় কাজগুলি মাত্র দেখিয়া বিচার করিলেই চলিবে না। দেখিতে হইবে—দৈনন্দিন জীবনে তিনি কিভাবে তাঁহার দরিদ্র অশিক্ষিত পাড়া প্রতিবাসীর সহিত ব্যবহার করিয়াছিলেন, কিভাবে তিনি তাহাদিগের সকল প্রকার সুখ দুঃখের সমভাগিনী হইবার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিলেন, সাঙ্ঘাতিক ব্যাধিগ্রস্তকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিবার জন্য তিনি কি ভাবে নিজ অমূল্য জীবনকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া তাহার সেবায় রত থাকিতেন, দারিদ্র্যের কঠোর কশাঘাত হইতে অপরকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি নিজের অবস্থা সচ্ছল না হইলেও কি

ভাবে মুক্তহস্তে দান করিতে অগ্রসর হইতেন, দুর্ভিক্ষের তাড়না হইতে গ্রামবাসীদিগকে রক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া কি ভাবে তিনি অনশন অনিদ্রা প্রভৃতি শারীরিক কঠোরতা স্বেচ্ছায় স্বীকার করিয়া দিনের পর দিন পদব্রজে বন্যার জল ভাঙ্গিয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমন করতঃ তাহাদিগের প্রকৃত অবস্থার সংবাদ সাধারণের অবগতির জন্য আনয়ন করিয়াছিলেন, এবং ভারতের প্রাচীন গৌরব ও অক্ষুণ্ণ জ্ঞানসম্পদের সহিত বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞানাবিষ্কৃত সত্যসমূহের সম্মিলনে দেশের রমণীকুলের মধ্যে যথার্থ শিক্ষার সম্প্রসারেই ভারতের ভবিষ্যত উন্নতি একমাত্র সম্ভবপর—এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি কি ভাবেই বা এক নূতন স্ত্রী-বিদ্যালয় স্থাপন ও অভিনব শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত করিয়া আমাদিগের কুলবধূগণের হৃদয় মনে বিশুদ্ধ প্রেমের অধিকার স্থাপনে সমর্থা হইয়াছিলেন!—আর দেখিতে ও পরিমাণ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে, নিত্যানুষ্ঠিত ঐ প্রকারের শত চেষ্টার পশ্চাতে বিরাজিত, তাঁহার হৃদয়ের সেই ভালবাসা, আয় ব্যয়, হ্রাস বৃদ্ধি রহিত ভালবাসা—যে অসীম ভালবাসায়

তিনি ভারতের প্রত্যেক নর নারীকে কা কথা, প্রত্যেক উপলখণ্ডকেও পবিত্র ও আপনার হইতে আপনার বলিয়া চিরকাল হৃদয়ে গ্রহণ করিতেন।

বাস্তবিক, মহতের মহত্বের পরিচয় আমরা চিরকালই ঐ ভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দৈনন্দিন কার্য্যসহায়ে হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকি। নতুবা দৈবাধীন ঘটনাচক্রের প্রবল প্রবাহে পড়িয়া বাধ্য হইয়া ভীরু কাপুরুষকেও অনেক সময় সংসারে বড় কাজ করিয়া ফেলিতে দেখা যায়। ভগিনী নিবেদিতার জীবনের সকল প্রকার ক্ষুদ্র চেষ্টা ও অনু-ষ্ঠানের পশ্চাতেই আমরা ঐরূপ যথার্থ মহত্বের নিত্য পরিচয় পাইয়াছি বলিয়াই সকল সম্প্রদায়ের সকল লোকেই অদ্য তাঁহার অদর্শনে শোকে ম্রিয়মান এবং সে জন্যই সকলে আজি তাঁহার জীবন্ত শক্তিমতি মূর্ত্তিহৃদয়ে স্থাপিত করিয়া গভীর শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার নিত্যপূজা করিতেছে।

ভগিনী নিবেদিতার পূর্ব্বোক্ত বিদ্যালয়ের সহিত বর্ত্তমান পুস্তিকাখানির লেখিকার এককালে এমন বিশেষ সম্বন্ধ ছিল যে তাঁহাকে নিবেদিতার ছাত্রীদিগেরই অন্যতমা বলা যাইতে পারে। নিবেদিতার সম্বন্ধে অনেকে

অনেক কথা আজি লিখিলেও তাঁহার দৈনন্দিন অন্তর্জীবনের মহত্ত্বের চিত্র ইনি যে ভাবে অঙ্কিত করিতে সমর্থা হইয়াছেন ইতিপূর্ব্বে ঐরূপ করিতে আর কেহ পারিয়াছেন বলিয়া আমাদের বোধ হয় না। না পারিবারই কথা। কারণ, পুরুষমাত্রেরই প্রবেশাধিকার রহিত উক্ত বিদ্যালয়ে ভগিনী নিবেদিতা গৃহস্থের পুরাঙ্গনাদিগকে নিত্য লইয়া আসিয়া তাঁহাদিগের অন্তরে সত্য, সদ্ভাব ও মহদাদর্শের বীজ সমূহ কি ভাবে বপন করিতেন ও কিরূপে ঐ সকলের ক্রমে পুষ্টিসাধন করতঃ ফলচ্ছায়াসমন্বিত মহামহীরুহে পরিণত করিতেছিলেন, শ্রদ্ধাসম্পন্না ছাত্রী ভিন্ন তাহার পরিচয় অন্য কে আর প্রদানে সমর্থ হইবে? সেজন্যই বলিতেছি, ক্ষুদ্রকায় হইলেও পুস্তিকাখানি হইতে পাঠক নিবেদিতার মানসিক মহত্ত্বের অনেক গূঢ় কথা জানিয়া মুগ্ধ হইবেন। ভগিনী নিবেদিতাকে বিশেষভাবে জানিবার জন্য সাধারণের আন্তরিক আগ্রহের ঐরূপে পরিতৃপ্তি সাধনের জন্য লেখিকা আমাদিগের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতার অধিকারিণী হইয়াছেন, একথা বলা বাহুল্য। অলমিতি—

সারদানন্দ।

Nivedita -

Printed by K. V. Seyne & Bros.

নিবেদিতা।

নিবেদিতা চলিয়া গিয়াছেন। আজ তাঁহার সম্বন্ধে কিছু লিখিতে গেলে নয়নাশ্রুরূপ কালী দিয়া না লিখিলে যথাযথ হইবে না। কারণ, তিনি যে সম্পূর্ণ-রূপে আমাদেরই ছিলেন, তিনি যে ভারতবর্ষকে কায়মনোবাক্যে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, একথা আমরা এখনই অন্তরে অন্তরে বুঝিতে পারিতেছি। ধন্য স্বামী বিবেকানন্দ যিনি এই দুর্লভরত্ন আনিয়া জননী ভারতবর্ষের পাদপদ্মে উপহার দিয়াছিলেন!

ভারতবর্ষের সহিত ভগিনী নিবেদিতার জীবনের পূর্ব্বোক্ত প্রকার একান্ত সংযোগ অতি বিচিত্র বলিয়া বোধ হয়। কোথায় ধনজনসম্পদময়ী সুদূর ইংলণ্ডের সুসভ্য সমাজে প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন জীবন, আর কোথায় ধ্বংশ-দশাগ্রস্থ ভারতবর্ষের কোন এক দরিদ্র পল্লীতে নিতান্ত অজ্ঞাত অপরিচিতভাবে জীবনযাপন! কোথায় সুখ

নিবেদিতা।

সৌভাগ্য ও আভিজাত্যের গৌরবলাভ, আর কোথায় দুঃখ দারিদ্র্য ও নিন্দা অপমানকে নিরন্তর অঙ্গভূষণ-স্বরূপে আলিঙ্গন! কোথায় স্বজন-গৃহ-পরিবারের সুখময় আশ্রয়ে বাস, আর কোথায় বহুদূরদেশে এক নিতান্ত বিভিন্ন আচারাবলম্বী ভিন্ন ভাষাভাষী বিদেশীর সহিত ধনী-দীন-জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা-পাশ! কোথায় উত্তুঙ্গ হিমাচল, আর কোথায় বা সাগরাভিমুখিনী স্রোতস্বতী! ঐকথা ভাবিতে গেলে কোন্ শক্তির দ্বার চালিত হইয়া নিবেদিতার জীবনের গতি ঐরূপে পরি-বর্ত্তিত হইয়াছিল প্রথমে তাহাই জানিতে কৌতূহল হয়। নিবেদিতা তাঁহার "The Master as I saw him" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন, পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকা-নন্দের সহিত সাক্ষাৎ ও পরিচয়ই তাঁহার এইরূপ ভাবে জীবনের গতি পরিবর্ত্তনের প্রধান কারণ।

১৮৯৫ খৃঃ অব্দে স্বামী বিবেকানন্দ যখন ইংলণ্ডে গিয়া বেদান্ত প্রচার করিতেছিলেন সেই সময় হইতে ভারতবর্ষীয় ধর্ম্ম ও দর্শনশাস্ত্রের দিকে নিবেদিতার মন আকৃষ্ট হয়। স্বামীজি বেদান্ত সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেন

এবং বক্তৃতাশেষে শ্রোতৃগণ ঐ সম্বন্ধে যাহা যাহা প্রশ্ন করিতেন তাহার মীমাংসা করিয়া দিতেন। ঐ সকল বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর শুনিয়াই নিবেদিতার মনে বর্ত্তমান-কালে প্রচলিত ইউরোপীয় দর্শন ও ধর্ম্মানুশাসনের সহিত ভারতীয় দর্শন ও ধর্ম্মের তুলনায় আলোচনা প্রথম উদিত হয়। যদিও নিবেদিতা তখন বেদান্তদর্শনের ভাব সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই, তথাপি উহা হইতে তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে বর্ত্তমান কালের ইউরোপীয় সভ্যতা, ধর্ম্ম, পরোপকার, প্রচার ও সমাজ প্রভৃতির মূলে আধ্যাত্মিকতা অল্প স্বল্প বিদ্যমান থাকিলেও পার্থিব ভাব ও ভোগসুখলালসাই বিশেষভাবে জড়িত রহিয়াছে। কিন্তু, প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা একেবারে পার্থিবভাবসম্পর্কশূন্য। পরহিতার্থ কর্ম্মানুষ্ঠানে যদি বিন্দু-মাত্র আত্মাভিমান ও স্বার্থানুসন্ধিৎসা থাকে তবে ফলহীন বৃক্ষের ন্যায় তাহা নিরর্থক হইয়া যায়। স্বামীজির ঐরূপ ধর্ম্মব্যাখ্যা ও বক্তৃতাবলী শুনিয়া নিবেদিতার মনের ভাব ক্রমশঃই পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হইল, এবং সেই সঙ্গে স্বামীজির প্রতিও তাঁহার শ্রদ্ধা প্রতিদিন বাড়িতে লাগিল।

নিবেদিতা।

নিবেদিতা কেবল যে বিদ্যাবতী ছিলেন তাহা নহে, কিন্তু অসাধারণ বুদ্ধিমতী ছিলেন। লোকচরিত্র অধ্যয়নে তাঁহার ন্যায় সুনিপুণা অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। স্বামীজির সহিত পরিচয়ে নিবেদিতা বুঝিতে পারিলেন, শুধু সুপণ্ডিত, দর্শনশাস্ত্রজ্ঞ ও অসামান্য প্রতিভাশালী হওয়াতেই স্বামী বিবেকানন্দ অলোকসাধারণ হয়েন নাই, কিন্তু তাঁহার অসাধারণ সত্যানুরাগ ও বীরত্ব প্রভাবেই তাঁহার চরিত্র এত অধিক সমুজ্জ্বল হইয়াছে। বুঝিলেন, তিনি আজ যাহা মনের সহিত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন ও সর্ব্বলোক সমক্ষে প্রচার করিতেছেন, কাল যদি সেই মতে ভ্রম দেখিতে পান তাহা হইলে বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করিয়া তখনই তাহা পরিত্যাগ করিতে পারেন, কেননা তিনি সত্যানু রাগী, তিনি বীর—তিনি ত্যাগ-মন্ত্র গ্রহণ করিয়া এমন ভাবে আপনাকে বিসর্জ্জন দিয়াছেন যে মান যশাদির কিছুরই আর আকাঙ্ক্ষা রাখেন না! অথবা, প্রতিষ্ঠা তো অতি তুচ্ছ কথা, যোগিগণের আজীবন তপস্যার ফলস্বরূপ মুক্তি বা নির্ব্বাণলাভও তিনি কামনা করেন না।

সম্পূর্ণ আত্মত্যাগ যদি কিছুরই কামনা রাখে না, তবে ঐরূপ ত্যাগী পুরুষের অনন্ত শূন্যতাই কি একমাত্র আশ্রয়স্থল? তাহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। নিবেদিতা বুঝিলেন এবং স্বামীজির সম্বন্ধে ঐ কথা লিখিয়াও গিয়াছেন।

"তিনি যে কেবল ত্যাগী সন্ন্যাসীই ছিলেন, তাহা নহে, মাতৃভূমির প্রতি তাঁহার অসাধারণ প্রেমের তুলনা হয় না। মাতৃভূমির যাহাতে যথার্থ কল্যাণ হয়, তাহার জন্য তিনি এমন কাজ করিতেও প্রস্তুত ছিলেন, যাহাতে তাঁহাকে যোগীজনকাম্য মুক্তিমার্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া নীরয়গামী হইতে হয়"। আবার কেবল ভারতবর্ষের জন্যই নহে, বুভুক্ষিত ও অত্যাচার পীড়িত, লোকসাধারণের জন্যও তিনি এইরূপ ভাবে আত্মদানে প্রস্তুত ছিলেন। তিনি উচ্চকণ্ঠে সকল দেশের সমাজকেই আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন—"What the world wants to-day, is twenty men and women who can dare to stand in the street yonder, and say that they

possess nothing but God. Who will go ?
* * * why should one fear ? If this is true,
what else could matter ? If it is not true,
what do our lives matter ?"

"যাহারা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া একেবারে পথে দাঁড়াইয়া সাহস করিয়া বলিতে পারিবে; ঈশ্বর ভিন্ন আর আমাদের কিছুই সম্বল নাই, এইরূপ রমণী ও পুরুষেরই পৃথিবীতে আজকাল প্রয়োজন হইয়াছে, অধিক নহে বিশ জনমাত্র হইলেই হইবে। কে কে ঐরূপ করিতে প্রস্তুত আছ ? * * * ঐরূপ করিতে ভয়ই বা কেন ? ঈশ্বর আছেন এবং তাঁহাকে পাওয়া যায় একথা যদি সত্য হয় তবে অপর সমস্ত ত্যাগে কি আসে যায় ? আর ঐকথা যদি সত্য না হয় (ঈশ্বর যদি না থাকেন) তবে জীবনধারণেই বা কি আসে যায় ?"

স্বামীজির পূর্ব্বোক্ত আহ্বান স্নিগ্ধগম্ভীর নির্ঘোষে নিবেদিতার কর্ণে ধ্বনিত হইয়া তাঁহার মর্ম্মস্পর্শ করিয়াছিল। তিনি মনে মনে এক প্রবল আকর্ষণ অনুভব করিয়াছিলেন, কে যেন তাঁহাকে এক

অপূর্ব্ব জ্বলন্ত ধর্ম্ম-বিশ্বাসের পথে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল!

স্বামীজি ঐ সময়ে ঐ বিষয়ে আরও বলিয়াছিলেন—"The world is in need of those whose life is one burning love—self-less. That love will make every word tell like a thunderbolt. Awake, awake, great souls! The world is burning in misery, can you sleep?"

"প্রেমের সর্ব্বগ্রাসী বহ্নিতে নিরন্তর দগ্ধ হইয়া যাহাদিগের জীবন জ্বলন্ত প্রেমমাত্র বলিয়াই প্রতীত হইবে, এইরূপ স্বার্থসম্পর্কমাত্রশূন্য পুরুষদিগেরই জগতে প্রয়োজন। ঐরূপ ভালবাসাই তোমাদের প্রত্যেক কথাটিকে বজ্রতুল্য অমোঘ করিবে। জাগো জাগো মহা-প্রাণগণ, পৃথিবী দুঃখক্লেশে দগ্ধ হইতেছে দেখিয়াও তোমরা কি নিদ্রিত থাকিবে?"

বাস্তবিক স্বামী বিবেকানন্দের ঐ সকল বাক্য নিবে-দিতার জীবনেই সফলীকৃত হইয়াছিল। ধন মান সম্পদ গৃহ পরিবার সমস্ত ত্যাগ করিয়া তিনি কেবলমাত্র

নিবেদিতা।

ভগবান্‌কে সম্বল করিয়াই সংসারে দাঁড়াইয়াছিলেন। সত্য সত্যই তাঁহার জীবন আত্মস্মৃতি-সম্পর্কমাত্র রহিত জ্বলন্ত প্রেমের দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইয়াছিল।

"নিবেদিতা!"—রূপ নামটি তাঁহাতে কি অদ্ভুতসার্থকতা সম্পন্নই হইয়াছিল। যথার্থই ভগবৎপাদপদ্মে তিনি সম্পূর্ণভাবে আত্ম-নিবেদন করিয়াছিলেন। অভিমানের বেড়া দিয়া পৃথক্ করিয়া 'আপনার' বলিতে এতটুকুও রাখেন নাই। ঐ নামটীতেই তাঁহার সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁহার পরিচয় দিবার জন্য অন্য কিছুরই আর আবশ্যক হয় না।

বোসপাড়ার একটী ছোট বাড়ীতে নিবেদিতা ও ক্রিশ্চিয়ানা একত্রে থাকিতেন, ঐ বাড়ীতেই মেয়েদের পাঠশালাও বসিত। সাধারণ হিসাবে বিদ্যালয় বলিলে যাহা বুঝায় এই বিদ্যালয়টী সেরূপ ধরণের নহে, স্বামী বিবেকানন্দ ব্রহ্মচারিণীগণের জন্য মঠপ্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, ঐ সঙ্কল্পকে ভিত্তি করিয়াই নিবেদিতা এই বিদ্যালয়ের স্থাপনা করিয়াছিলেন। এই বিদ্যালয়ের কার্য্যেই নিবেদিতা তাঁহার জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন,

এবং এই বিদ্যালয়ের কার্য্যেই তাঁহার জীবনদানও করিয়া গিয়াছেন। বোসপাড়ার একটী ছোট গলি, তাহার ভিতর একটী ক্ষুদ্র বিদ্যালয় এবং নিবেদিতার ন্যায় অসাধারণ প্রতিভাশালিনী একান্ত নিষ্ঠাব্রতা-বলম্বিনী রমণী, যাঁহার পক্ষে পৃথিবীতে কোন কার্য্যে সফল হওয়াই অসম্ভব ছিল না,—নিবেদিতা তাঁহার সমস্ত জীবন ঐ ক্ষুদ্র বিদ্যালয়ের জন্য দান করিয়া গিয়াছেন, একথা শুনিলেই প্রথমে আশ্চর্য্য হইতে হয়। ঐরূপ ভাবে জীবন উৎসর্গ করাটাকে অনেকে শক্তির অযথা অপচয় বলিয়াও মনে করিয়া থাকেন। এই জন্য নিবেদিতাকে ও নিবেদিতার সঙ্কল্পিত কার্য্যকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে ভারতের পুনর্জ্জীবনলাভের উপায় সম্বন্ধে তাঁহার যাহা মত ছিল প্রথমে তাহাই বুঝিয়া লইতে হয়।

সকল মানবের পক্ষেই একমাত্র সনাতন ধর্ম্ম—মনুষ্যত্ব-লাভ, সেই মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করিয়া তুলাই আবার শিক্ষার উদ্দেশ্য। শিক্ষার উদ্দেশ্য ঐরূপে এক হইলেও দেশ, কাল ও প্রয়োজনভেদে শিক্ষাপ্রণালী কিন্তু

বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়া থাকে। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় শিক্ষাপ্রণালী যেরূপ হওয়া উচিত নিবেদিতা তাঁহার "The web of Indian life" এবং "The Master as I saw him" নামক পুস্তকদ্বয়ে সে সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছেন, তাহা হইতেই আমরা তাঁহার মতের সারমর্ম্ম নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। নিবেদিতা বলিয়াছেন—"পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘর্ষে ভারতের সর্ব্বত্র একটা অশান্তির ভাবের উদয় হইয়াছে; সেই সঙ্গে আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার উন্নতির জন্য সর্ব্বপ্রকার অভাবমোচনকারী শত শত ঔষধ বা উপায়ও আবিষ্কৃত হইতেছে। উন্নতিকামীগণের ভিতর একদলের নাম সমাজসংস্কারক; ইঁহারা মনে করেন ভারতবর্ষের কতকগুলি প্রাচীন সামাজিক প্রথা ধ্বংস করিলেই মাতৃভূমির উন্নতি হইবে। সমাজসংস্কারের জন্য এই দলের প্রবল উৎসাহ দেখিয়া বুঝা যায়, ভারতবর্ষ এখনও প্রাণহীন হয় নাই। ভারতের জীবন-দীপ যদি একেবারে নির্ব্বাপিত হইয়া যাইত তাহা হইলে কি

আর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংঘর্ষে সংস্কারকরূপ এই সকল অগ্নিস্ফুলিঙ্গের অভ্যুদয় হইত? আবার দেখা যায় ঐ দলের ভাসা ভাসা উপর উপরের সংস্কারের চেষ্টায় ভারতবর্ষ প্রাচীন যুগের ন্যায় এখনও বিচলিত নহে, তাহাতে কি ইহাই বুঝায় না যে, ভারতের আভ্যন্তরীণ গভীরতা, গুরুত্ব ও সজীবতা এখনও প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান ?

"ভারতবর্ষের উন্নতিকামী আর একদলের নাম রাজনৈতিক আন্দোলনকারী। পাশ্চাত্য রাজনীতির প্রচলনই ভারতকে মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার করিবার প্রকৃষ্ট উপায়, ইহাই তাঁহাদের বিশ্বাস। আমরা বলি, বৈদেশিক রাষ্ট্রপরিচালন-প্রণালীর মধ্যগত অনেক নিয়মই যে এখন ভারতের আত্মস্থ করিয়া লওয়া প্রয়োজন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় "রাজনীতি" কথাটি পর্য্যন্ত প্রয়োগ ক্লেশকর আত্মপ্রবঞ্চনা (painful insincerity) ভিন্ন আর কিছুই নহে।

অপর একদল আছেন যাঁহাদের মতে ধর্ম্মের বিভিন্ন

কেন্দ্রগুলিকে সজাগ করিয়া তোলাই এখন ভারতের উন্নতির উপায়। তদ্ভিন্ন আর এক চতুর্থ দলও আছেন যাঁহাদের মতে, অর্থনীতি-শাস্ত্রঘটিত নিয়ম সকলের অপব্যবহারই (economic grievances) ভারতের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার একমাত্র কারণ; ঐ বিষয়ের প্রতিকারের দ্বারা দরিদ্রভারতের দারিদ্র্যদশা দূর করিতে পারিলেই দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথে আর বাধা থাকিবে না।"

বর্ত্তমান ভারতের উন্নতিকামনাশীল দল সকলের পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পরিচয় দিয়া নিবেদিতা বলিতেছেন, "সামাজিক সংশোধন, রাজনৈতিকশিক্ষা, নির্জ্জীব ধর্ম্ম-ভাবকে সজীবকরণ, অথবা অর্থনীতিসহায়ে দেশের অভাবপূরণ, যাহাই বল না কেন, ঐ সকলের আধার-স্বরূপ ঐ সকল অপেক্ষা দেশের অধিক প্রয়োজনীয়, অধিক বাস্তব একটী পদার্থ আছে, উহা ভারতবর্ষের জাতীয়ত্ব। এই জাতীয়ত্ব বিশাল ভারতের অসংখ্য সম্প্রদায়ের কাহারও নিজস্ব সম্পত্তি নহে, অথচ জাতীয়ত্ব-রূপ মিলনসূত্রই সকল সম্প্রদায়কে যথাস্থানে ধরিয়া

রাখিয়াছে। সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি অথবা ধর্ম্মনীতি, যে দিক দিয়াই যে কেহ ভারতের উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা সকলে পরোক্ষভাবে ঐ জাতীয়ত্বকেই জাগ্রত করিয়া তুলিতেছেন। ভারতের প্রাচীন কলাবিদ্যা, প্রাচীন পাণ্ডিত্য, পুরাতন ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি সকল বিষয়ই এই জাতীয়ত্বের অভ্যুদয়ে সহায়তা করিয়াছে। ভারতের প্রাচীন জাতীয়ত্বের ইহা একটী জীবন্ত নূতন ভাষ্যস্বরূপ। অথবা সংক্ষেপে বলিতে গেলে জাতীয়ত্বের এই নবাদর্শ বিগত জাতির যথার্থ ই আত্মজস্বরূপ। ঐ নূতন আদর্শ যুবকগণকে জীবন্ত করিয়া তুলিবে এবং প্রাচীনগণের শ্রদ্ধার ভিত্তিস্বরূপ হইবে। এই নবাদর্শের প্রভাবে ভারতবর্ষের প্রত্যেক ব্যক্তি, সম্প্রদায় ও সমাজ জীবনস্পন্দনে স্পন্দিত হইবে এবং উহাতেই ইহার অন্তর্নিহিত শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইবে। আপন কেন্দ্রে সকলকে আয়ত্ত করিয়া রাখিয়া সর্ব্ববিষয়ে আপনাকেই বিকশিত করিয়া তুলিবার ক্ষমতা উহার ক্রমশঃ এরূপ বৃদ্ধি পাইবে যে এ পর্য্যন্ত ঐরূপ আর কোন সম্প্রদায় বা বিষয়েই দেখা যায় নাই।

নিবেদিতা।

জাতীয় জীবনের এই নব আদর্শ ভারতে পূর্ণ বিকশিত করিয়া তুলিবার জন্য দুইটী জিনিষের প্রয়োজন। প্রথম, মাতৃভূমির প্রতি প্রেম—জ্বলন্ত প্রেম! যে প্রেম আত্মা হইতে, বিত্ত হইতে, পুত্র হইতেও অধিক, এইরূপ প্রেম। যিনি সর্ব্বকাল সকল সম্প্রদায়কে সমভাবে ক্রোড়ে ধারণ করিয়াছেন, সকল ধর্ম্মকেই নির্ব্বিশেষে আশ্রয় দিয়াছেন, সেই সর্ব্বধাত্রী মাতৃভূমিকে আপনার সম্প্রদায়ের প্রতি লোকের যে প্রেম এখন দেখা যায় তাহা অপেক্ষাও অধিক প্রেম করিতে হইবে। ভাই যেমন ভাইকে আপনা হইতেও অধিক ভালবাসে তেমনি মাতৃভূমির বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী, বিভিন্ন ভাষা-ভাষী, বিভিন্ন মতাশ্রয়ী, ধনী, দরিদ্র প্রত্যেক মনুষ্যকে নির্ব্বিচারে আপনা অপেক্ষা অধিক ঘনীভূত ভাবে প্রেম করিতে হইবে। এই জ্বলন্তপ্রেমই সম্প্রদায়ের গণ্ডি ছাড়াইয়া সমগ্র ভারতবাসীকে এক করিয়া লইবে।

"দ্বিতীয়তঃ শিক্ষা। এই শিক্ষার অর্থ বাহিরের জ্ঞান ও শক্তি আহরণ করা নহে, আপনার ভিতরের শক্তিকে সম্যক্ বিকশিত করিয়া তুলা। ভারতবর্ষের শিক্ষার

ভিত্তিই হইল ত্যাগ ও প্রেম। আত্মত্যাগেই প্রেমের জন্ম, আবার প্রেমই ত্যাগের উৎপত্তি ও ব্যাপ্তি। ত্যাগ অর্থে নিঃস্ব হওয়া নহে, কিন্তু অক্ষয় ধনে ধনী হইবার পথই ত্যাগ। ত্যাগ অর্থে সংসারের ভয়ে পলায়ন করা নহে, কিন্তু জগৎসমাজে বিজয়ী হইবার একমাত্র উপায়ই হইল ত্যাগ, আত্মত্যাগ। কিন্তু ঐ ত্যাগ আবার একেবারে স্বার্থবোধমাত্রবিহীন হওয়া চাই। যাহার ত্যাগে অজ্ঞাতসারেও অভিমান অথবা কামনার ছায়া স্পর্শ করে তাঁহার অমূল্য দানও ধূলিমুষ্টিদানের ন্যায় তুচ্ছ হইয়া যায়।"

নিবেদিতার মতে পূর্ব্বোক্ত প্রকার ত্যাগ ও প্রেম-লাভ করিতেই ভারতবর্ষ সনাতন কাল হইতে শিক্ষা দিয়াছে। ঐ জাতীয় শিক্ষা বংশপরম্পরাগত হইয়া প্রত্যেক ভারতবাসীর অন্তর্নিহিত রহিয়াছে এবং উহাকে জাগ্রত করিয়া তুলাই বর্ত্তমান শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া কর্ত্তব্য। শিক্ষা যতকাল কেবলমাত্র গ্রন্থপাঠেই নিবদ্ধ থাকে ততকাল যথার্থ জ্ঞান বহুদূরে থাকে; অথবা উহাকে কতকগুলি অঙ্কিত রেখামাত্রের জ্ঞানই বলা

যাইতে পারে। বুদ্ধিসহায়ে উহা দ্বারা জ্ঞানের অস্পষ্ট ছায়াময়ী মূর্ত্তি কখন দেখা যাইলেও উহাতে জীবন দেখা যায় না। অতএব মানবহৃদয়ে নানা ভাবসমূহ যাহা দ্বারা জাগ্রত হইয়া উঠে তাহাই প্রকৃত শিক্ষা। ঐরূপ শিক্ষালাভেই তাহার সমগ্র জীবনের ছোট বড় প্রত্যেক কার্য্য, বাক্য ও চিন্তায় প্রতি মুহূর্ত্তে শিক্ষার সাফল্য প্রস্ফুটিত হয়।" নিবেদিতা এই ভাবেই ভারত-বর্ষীয় রমণীগণের ভিতর শিক্ষা জাগ্রত করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন, এবং ঐ উদ্দেশ্য সাধনেই পূর্ব্বোক্ত বিদ্যা-লয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

পাশ্চাত্য সভ্যতার আবির্ভাবের প্রারম্ভে ভারতে রমণীগণকে বিদ্যাশিক্ষা দিবার জন্য যখন প্রথম চেষ্টা হইয়াছিল তখন সমাজ তাহার বিরোধী হইয়াছিল। তখন অনেকেরই ধারণা ছিল যে, ভিন্নপ্রদেশীয় রমণী হইতে ভারতরমণীর যে মৌলিক বিশেষত্ব আছে তাহা পাশ্চাত্যের অনুকরণশীল শিক্ষায় ধ্বংশ হইয়া যাইবে। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রবল বন্যায় আমাদের তৎকালীন যুবক-সমাজ একেবারে ভাসিয়া যাইলেও

উহাদের ঐ মোহকরী প্রভাব যে ভারতবর্ষের অন্তঃপুরে সেরূপভাবে বিস্তৃত হইতে পারে নাই তাহা ঐ বিরোধের ফলেই বলিতে হইবে। পতি, পুত্র, আত্মীয়, স্বজন, প্রতিবাসী, পরিচিতের নিয়ত কল্যাণধ্যানে দেহবোধ পর্য্যন্ত বিরহিতা, নিয়ত শ্রমপরায়ণা আমাদের পূর্ব্ব-পিতামহীগণের জীবনযাপনের বিশুদ্ধ স্মৃতি, বিশুষ্ক বকুলমালার সৌরভের ন্যায় ভারতবর্ষের অন্তঃপুরেই রক্ষিত ছিল, নবশিক্ষার প্রবল ঝটিকায় তাহা একেবারে উড়িয়া যায় নাই। ভগিনী নিবেদিতা সুদূর প্রতীচ্য দেশ হইতে সেই সৌরভে আকৃষ্টা হইয়াছিলেন।

রমণী, জাতীর জননী। একটী দীপ হইতে আর একটী দীপ জ্বালিবার মত মায়ের জীবনের দয়া-দাক্ষিণ্যাদি গুণসমূহই সন্তানের জীবনে ঐ সকলের উদয় করিয়া থাকে। নিবেদিতা তাঁহার পুস্তকে এক স্থানে লিখিয়াছেন, "রমণীই সর্ব্বদেশে নীতি ও সদাচারের আদর্শের রক্ষাকর্ত্রী। শিশুকাল হইতে জননী কর্ত্তৃক পরোপকারাদি সৎকার্য্যের প্রশংসা শ্রবণে চিত্তে ঐ বিষয়ক অনুরাগ স্ফুরিত না হইলে যুবক নিঃসহায়ের

শবদেহ দাহঘাটে লইয়া যাইবার জন্য কখনই ব্যগ্র হইবে না। স্ত্রী, স্বামীর সুখের জন্য প্রাণপণ না করিলে এবং তাঁহার চরিত্রগত গুণগুলি স্মরণ করিয়া সুখী না হইলে কয়জন পুরুষ সাধু ও সদ্ভাবে আপন জীবন পরিচালিত করিতে যত্নপরায়ণ হইবে? এতদ্ব্যতীত সর্ব্বদেশেই দেখিতে পাওয়া যায় রমণীগণ প্রত্যেক উচ্চাদর্শ কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তাহাদিগের জীবন সর্ব্বাগ্রে প্রদান করিয়া থাকে।"

রমণী আবার সংসারের স্থিতিবিধায়িনী। শোণিত-ধারায় প্রবাহিত কুলক্রমাগত যে সকল মহৎভাব আজি পর্য্যন্ত ভারতরমণীর প্রকৃতির মধ্যে রক্ষিত রহিয়াছে, স্বামী বিবেকানন্দ সেই সকল ভাবকেই শিক্ষা ও সংস্কারের দ্বারা নবভাবে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। স্বামীজির সেই ইচ্ছাকে অনুবর্ত্তন করিয়াই ভগিনী নিবেদিতা এই শিক্ষালয়ের কার্য্যে তাঁহার জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। অতএব যদিও উহার আয়তন বৃহৎ ছিল না তথাপি নিবেদিতা বুঝিয়াছিলেন, করাল জ্বালাময়ী অগ্ন্যুৎপাদনের প্রয়োজন হইলে রাশি রাশি

ইন্ধন সংগ্রহে জীবনযাপনই একমাত্র আবশ্যকীয় নহে। সামান্য ইন্ধনে অগ্ন্যুৎপাদন করিয়া ধীরে ধীরে উহার পোষণ করিতে পারিলে কালে উহা আপনা হইতেই চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িবে। তাঁহার স্থির বিশ্বাস ছিল. এই বিদ্যালয় হইতেই ভারতবর্ষে মৈত্রেয়ী, গার্গীর পুনরভ্যুদয় হইবে।

এই শিক্ষালয়ে ছোট ছোট বালিকা হইতে আরম্ভ করিয়া বয়ঃপ্রাপ্তা, বধু, গৃহিণী ও বিধবাগণের সকলকেই যিনি যেরূপভাবে শিক্ষালাভ করিতে চাহেন তাঁহাকে সেইরূপভাবে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা ছিল। ভাষা, অঙ্ক, শিল্পকার্য্য, সেলাই এবং চিত্রবিদ্যাও শিক্ষা দেওয়া হইত। নিম্নশ্রেণীর ছোট ছোট মেয়েদের উচ্চশ্রেণীর মেয়েরাই শিক্ষা দিত। উচ্চশ্রেণীর মেয়েদের মধ্যে তিন চারিটী এরূপ বালবিধবাও ছিল, যাহারা এই বিদ্যা-লয়ের কার্য্যেই জীবন সমর্পণ করিবে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিল। চিরকুমারী-ব্রতাবলম্বিনী শ্রীমতী সুধীরা উচ্চশ্রেণীর মেয়েদের শিক্ষয়িত্রী এবং সমস্ত বিদ্যালয়েরই একপ্রকার পরিচালিকা ছিলেন। তিনি কোনরূপ বেতন

বা পারিতোষিক না লইয়া স্বেচ্ছায় বিদ্যালয়ের কার্য্য-ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় উন্নতমনা ও ধর্ম্মপরায়ণা রমণী অতি দুর্ল্লভ। সন্তানের কল্যাণে মাতার যেরূপ প্রাণপণ চেষ্টা থাকে বিদ্যালয়ের ছাত্রী-গণের কল্যাণের জন্য তাঁহার চেষ্টাও সেইরূপ ঐকান্তিক ছিল, এজন্য ছাত্রীরাও তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভাল-বাসিত ও সকল প্রকারে তাঁহার আদেশ পালনের চেষ্টা করিত। শিক্ষালয় পরিচালনে শ্রীমতী সুধীরাদেবীই নিবেদিতা ও ক্রিশ্চিয়ানার দক্ষিণহস্তস্বরূপা ছিলেন।

শিক্ষালয়-বাড়ীটী তেমন স্বাস্থ্যকর ছিল না। উপরের ঘরগুলি ছোট ছোট, ছাতও নীচু, গ্রীষ্মকালের দ্বিপ্রহরে সেই ঘরগুলি এত গরম হইত যে, কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে থাকিলেই মাথা ধরিয়া যাইত। গ্রীষ্ম-প্রধান দেশবাসীর পক্ষে এইরূপ গরম সহ্য করা অনেকটা অভ্যস্ত, কিন্তু শীতপ্রধান দেশের অধি-বাসীদিগের পক্ষে গ্রীষ্মকালে এদেশে সেরূপ গৃহে বাস করা যে কিরূপ কষ্টকর তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

নিবেদিতা বা ক্রিশ্চিয়ানার ঘরে গ্রীষ্মনিবারণের জন্য একখানি টানা পাখাও ছিল না! একখানি হাত-পাখাই সর্ব্বদা নিবেদিতার কাছে থাকিত! তাঁহার ছোট ঘরটী তিনি নিজের ইচ্ছামত সাজাইয়াছিলেন। সেই ঘরের ভিতর দিনের অধিকাংশ সময়ই তিনি কাযের মধ্যে ডুবিয়া থাকিতেন। বেশীর ভাগই লেখা-পড়ার কায। কার্য্যকালে তাঁহার মন এত একাগ্র হইত যে সে সময়ে তাঁহার শীতগ্রীষ্ম বোধ থাকিত না। আমরা দেখিয়াছি কাজ ছাড়িয়া যখন তিনি কখন কখন বাহিরে আসিতেন তখন অসহ্য গরমে তাঁহার মুখ চোখ রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপে তিনি এক একবার এঘর ওঘর ঘুরিয়া ছাত্রীরা কে কোথায় কি করিতেছে তাহা দেখিয়া আসিতেন। ঐ সময়ে একদিন কপালে হাত দিয়া মাঝে মাঝে চাপিয়া ধরিতেছেন দেখিয়া শিক্ষয়িত্রীদিগের কেহ কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন "মাথায় বড় কষ্ট!" তখনই আবার গিয়া কিন্তু কাগজ কলম লইয়া বসিলেন।

ঐ লেখাপড়াকাযও তাঁহার বিদ্যালয়েরই জন্য।

বিদ্যালয়ের অর্থানুকুল্যের জন্যই তাঁহার পুস্তক লিখিবার অধিক প্রয়োজন হইত। ঐরূপ পরিশ্রম করিয়াও মাঝে মাঝে যখন খরচের টানাটানি পড়িত, তখন নিজের সম্বন্ধে কোন্ খরচটা কমাইতে পারা যায় সেই দিকেই অগ্রে তাঁহার দৃষ্টি পড়িত এবং নিজের শরীর পোষণে যে যৎসামান্য ব্যয় তাহাও যেন তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিত। ফলে, শারীরিক অনিয়মে তাঁহার শরীর দিন দিন রক্তহীন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িত, তখন বাধ্য হইয়া তাঁহাকে কিছুদিনের জন্য স্থানপরিবর্ত্তনে যাইতে হইত। মনের একাগ্রতার জন্য শরীরসম্বন্ধে তাঁহার লক্ষ্যই ছিল না, সে জন্য শরীর যে দিন দিন ভগ্ন হইতেছে তাহা যেন তিনি বুঝিতেই পারিতেন না।

বিদ্যালয়ের জন্য সাহায্যার্থী হইয়া যদিও তিনি দ্বারে দ্বারে দণ্ডায়মান হন নাই, তথাপি বিদ্যালয়ের আর্থিক অনাটনের বিষয় আমাদের দেশবাসীগণের যে একেবারেই অজ্ঞাত ছিল তাহা নহে। এই বিদ্যালয়ের একটী শাখা-বিদ্যালয় ছিল, সেটাতে কেবল ছোট মেয়েদেরই শিক্ষা দেওয়া হইত। আর্থিক অভাবের জন্য

নিবেদিতা যখন কোনরূপে সেই পাঠশালাটীকে রক্ষা করিতে পারিলেন না,তখন মাসিক ত্রিশটী টাকা যদি সাহায্য পান সে জন্য কয়েকবার 'বেঙ্গলী' কাগজে আবেদন প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেও যখন কোন ফল হইল না তখন অগত্যা পাঠশালাটী তুলিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার "ভগিনী নিবেদিতা" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন "তিনি যে ইহার ব্যয় বহন করিয়াছেন তাহা চাঁদার টাকা হইতে নহে, উদ্বৃত্ত অর্থ হইতে নহে, একেবারেই উদরান্নের অংশ হইতে"—ইহা সম্পূর্ণ সত্য কথা।

নিবেদিতা আর এখন নাই। কিন্তু অর্দ্ধাশনে অনশনে থাকিয়া তিনি ভারতবর্ষে যে একমাত্র জাতীয়-রমণীবিদ্যালয় স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন এখনও কি দেশবাসীর তাহার দিকে দৃষ্টি দিবার অবসর ঘটিবে না?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বড় মেয়েদের শিক্ষা দিবার ভার প্রধানতঃ ভগ্নী ক্রিশ্চিয়ানা ও শ্রীমতী সুধীরার উপর ছিল কিন্তু নিবেদিতা যখনই অবসর পাইতেন তখনই ঐ ছাত্রীদের শিক্ষার ভার লইতেন। গণিত ও চিত্রবিদ্যা এই

দুইটাই তিনি বেশীর ভাগ শিক্ষা দিতেন। অবসরমত ইংরাজী ভাষাও শিখাইতেন। তাঁহার শিখাইবার প্রণালী অত্যন্ত সুন্দর ও নূতন ধরণের ছিল। তিনি গণিত ও চিত্রবিদ্যা যে প্রণালীতে শিখাইতেন, তাহাতে যাহাদের শিখিবার ও বুঝিবার ক্ষমতা কম, তাহারাও অতি সহজে উহা আয়ত্ত করিয়া লইত। ছোট ছোট মেয়েরা তেঁতু-লের অথবা অন্য কোন ফলের বীজ লইয়া খেলা করিতে করিতে প্রথমে গণনা শিখিত। 'জোড় কি বিজোড়' খেলাতেই প্রথমে ছোট ছোট মেয়েদের যোগ বিয়োগ অভ্যাস হইত, তাহার পর তাহারা শ্লেটে অঙ্ক রাখিয়া অঙ্ক কসিতে শিখিত। শিক্ষালয়ের বড় মেয়েরা ছোট মেয়েদের শিক্ষা দিত। নিবেদিতা তাহাদের শিক্ষা দিবার প্রণালীসম্বন্ধে যেরূপ ভাবে উপদেশ দিতেন তাহার কিছু এখানে তাঁহার নিজের কথাতেই দিলাম ;—
"মেয়েরা যদি কিছু না জানে তবে তাহাদের বলিবে 'আচ্ছা আমরা চেষ্টা করিব তাহা হইলে নিশ্চয় শিখিতে পারিব।' মেয়েরা যদি কিছু বলিতে পারে আর কিছু ভুল করে তবে তাহাদের বলিবে 'হাঁ, হইল, কিন্তু আমরা

আরও ভাল করিতে চেষ্টা করিব'। যদি কোন মেয়ে ঠিক করিয়া বলিতে পারে তবে তাহাকে বলিবে 'ঠিক, ঠিক।' এবং অন্য মেয়েদের বলিবে 'আমরাও পারিব, আবার আমরা চেষ্টা করিব।" কথা বলিবার সময় তিনি কতকগুলি কথা বিশেষভাবে জোর দিয়া বলিতেন। "নিশ্চয়" কথাটীর উপর ঐরূপ জোর দিতেন। আবার যখন কাহারও কোন বিষয় ঠিক হইত তখন 'ঠিক, ঠিক!' বলিয়া বালিকার মত আনন্দে হাততালি দিতেন। মেয়েদের লেখায় অথবা অঙ্কে যদি ভুল থাকিত তবে তখনই তাহা ভাল করিয়া কাটিয়া দিতেন এবং সর্ব্বদা বলিতেন "ভুল কখনও রাখিবে না। ভুল বুঝিবামাত্র কাটিয়া দিবে।"

ভারতবর্ষীয় ভাস্কর্য্য ও চিত্র প্রভৃতির কলাবিদ্যার উপর তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। ভারতীয় কলা-বিদ্যা সকলের মূলে আধ্যাত্মিকতার বীজ যে নিহিত আছে ইহা তিনি অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিতেন। বৈদেশিক অনুকরণে অঙ্কিত আজকালকার চিত্র অপেক্ষা মেয়েদের হাতের আঁকা পিঁড়ি আল্পনা ইত্যাদি

তাঁহার নিকট অধিক আদরের পদার্থ ছিল। একটী মেয়ের হাতের আঁকা আল্‌পনা তিনি তাঁহার শয়নগৃহে টাঙ্গা-ইয়া রাখিয়াছিলেন; ঐ আল্‌পনার মধ্যে একটী বড় শতদল পদ্ম ও চারিপাশে ছোট ছোট যুঁইফুলের মত ফুল লেখা ছিল। ঐ আল্‌পনা তাঁহার এত ভাল লাগিয়াছিল যে, চিত্রকলাবিচারসক্ষম যে কেহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন, তাঁহাকেই তিনি ঐ আল্‌পনা দেখাইতেন। একদিন মহানন্দে ছাত্রীদিগের নিকট আসিয়া বলিলেন "কুমার স্বামী আজ এই আল্‌পনার অনেক প্রশংসা করিলেন।" কুমার স্বামী যে তাঁহার ছাত্রীর অঙ্কিত আল্‌পনার প্রশংসা করিয়া-ছেন এ আনন্দ তাঁহার আর রাখিবার যেন স্থান নাই, তাঁহার মুখ দেখিয়া তখন এইরূপ বোধ হইতে লাগিল। পদ্মফুলের চিত্র, বিশেষতঃ সহস্রদল শ্বেতপদ্মের চিত্র তাঁহার বড়ই প্রিয় ছিল। তিনি বলিতেন এই ফুল ভারতবর্ষীয় চিত্রকর ভিন্ন পৃথিবীতে অন্য কেহ আর আঁকিতে জানে না। পূর্ব্বোক্ত আল্‌পনার পদ্মের চারি-পাশের ছোঠ ছোট ফুলগুলি দেখাইয়া তিনি প্রায়ই

বলিতেন, "কি সুন্দর সাদা ছোট ফুল! এই ছোট ফুল-গুলি সকলেই ঐ বড় ফুলের দিকে মুখ ফিরাইয়া আছে, যেন বলিতেছে, আমরা তোমার কাছেই যাইতে চাই।" মেয়েদের পাথরে ও মাটীতে ছাঁচকাটা শিখাইবার নিবেদিতা অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। ছাঁচ কাটি-বার জন্য একরাশি মাটী ও নরুণ আনিয়া সকল মেয়ে-দের সঙ্গে লইয়া "আমরা সকলেই শিখিব" বলিয়া অত্যন্ত উৎসাহের সহিত ছাঁচ কাটিতে বসিতেন। তাঁহার ঐরূপ উৎসাহে তখন অনেক মেয়ে ছাঁচ কাটিতে অভ্যাস করিতেছিল। তাহাদের কেহ প্রথম যে ছাঁচটী প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে আনিয়া দিত, সেটী যতই খারাপ হউক না কেন, তিনি অতি আদরের সহিত তাহা লই-তেন এবং দেবতার প্রসাদ যেমন লোকে মাথায় ধারণ করে সেইরূপ ভাবে মাথায় ছুঁয়াইয়া নিজের ঘরে সাজা-ইয়া রাখিতেন। ছোট মেয়েরা তাঁহাকে ছোট ছোট পুতুল গড়িয়া আনিয়া দিত; সে পুতুলগুলি তিনি একটী বাক্সে করিয়া রাখিতেন! এইরূপে তাঁহার ঘরে মেয়েদের হাতে প্রস্তুত ঐরূপ দ্রব্য সকল স্তরে স্তরে সাজান

থাকিত। এক এক দিন সব মেয়েদের একত্র করিয়া ঐ সকল দ্রব্য দেখাইয়া তাহাদের হাতের শিল্প কেমন ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতেছে তাহা তিনি দেখাইতেন ও বুঝাইয়া দিতেন। এক সময়ে মেয়েদের সপ্তাহের মধ্যে একদিন করিয়া সংস্কৃত শিখানো হইবে এইরূপ প্রস্তাব হইয়াছিল। নিবেদিতা তাহাতে বলেন, "যেদিন মেয়েদের হাতে তালপাতে লেখা সংস্কৃত শ্লোক আমার ঘরের দেয়ালে শোভা পাইবে সে দিন কি আনন্দের দিনই হইবে।"

সপ্তাহের মধ্যে একদিন অথবা দুইদিন তিনি ইতিহাস পাঠ দিতেন। সে সময় তিনি এতই তন্ময় হইয়া যাইতেন যে, তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইত তিনি কোথায় আছেন ও কাহাদের নিকট বলিতেছেন তাহাও তখন যেন তাঁহার মনে নাই। এক দিন রাজপুতানার ইতিহাস বলিতে বলিতে তিনি স্বয়ং যখন চিতোর গিয়াছিলেন তাঁহার সেই সময়ের ভ্রমণকাহিনী এইরূপে বলিতে লাগিলেন—"আমি পাহাড়ে উঠিয়া পাথরের উপর হাঁটু গাড়িয়া বসিলাম, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পদ্মিনী

দেবীর কথা স্মরণ করিলাম”—বলিতে বলিতে নিবেদিতা যথার্থই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া হাতযোড় করিয়া বসিলেন। নিবেদিতার তখনকার মুখের ভাব যিনি দেখিয়াছেন তিনি কখন আর তাহা ভুলিতে পারিবেন না। নিবেদিতা বলিতে লাগিলেন “অনল কুণ্ডের সম্মুখে পদ্মিনী দেবী হাতযোড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। আমি চোখ বুজিয়া পদ্মিনীর শেষ চিন্তা মনে আনিতে চেষ্টা করিলাম। আঃ কি সুন্দর! কি সুন্দর!”—বলিতে বলিতে ভাবাবেশে মুগ্ধা নিবেদিতা কিছুক্ষণ মুদ্রিত নেত্রে নীরব হইয়া বসিয়া রহিলেন!—তিনি যে স্কুল-ঘরে বালিকাদের সম্মুখে বসিয়া তাহাদের ইতিহাস পাঠ দিতেছেন তাহা আর তখন তাঁহার মনে নাই, পদ্মিনীর শেষ চিন্তায় তন্মুহূর্ত্তে তাঁহার মন লয় হইয়া গিয়াছে।

তাঁহার ঐরূপ তন্ময়ভাব আমরা কতবার দেখিয়াছি। ভারতবর্ষের কথা উঠিলেই তিনি একেবারে ভাবমগ্না হইয়া যাইতেন। মেয়েদের বলিতেন “ভারতবর্ষ! ভারতবর্ষ!! ভারতবর্ষ!! মা! মা! মা! ভারতের কন্যাগণ, তোমরা সকলে জপ করিবে, ভারতবর্ষ! ভারতবর্ষ!

নিবেদিতা।

ভারতবর্ষ! মা! মা! মা!" বলিয়া নিজের জপ-মালা হাতে লইয়া নিজেই জপ করিতে লাগিলেন 'মা! মা! মা!' ভারতবর্ষ যে তাঁহার প্রাণের প্রাণস্বরূপ কত প্রিয় ছিল তাহা বলিয়া বুঝাইবার ভাষা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না! কে জানে কে তাঁহার চোখে এমন সোনার কাজল পরাইয়া দিয়াছিল যে তাঁহার নিকট ভারতের সকল পদার্থই সুবর্ণময় হইয়া গিয়াছিল। কে জানে তাঁহার গুরুদেব তাঁহাকে দীক্ষা দিয়া মৃণ্ময়ী ভারতের ভিতর কি চিণ্ময়ী প্রতিমার অধিষ্ঠান দেখাইয়া ছিলেন যাহাতে ভারতের ধূলিকনার ভিতরও তিনি আধ্যাত্মিকতারূপ অমৃতরসের সর্ব্বদা আস্বাদ পাইতেন!—এবং সেই অমৃত-পানে বিভোর হইয়া তিনি যাহা বলিতেন তাহা শুনিয়া কত লোক তাঁহাকে পাগল বলিত। কিন্তু ধন, মান, যশ লইয়াই যাহারা দিবারাত্র পাগল হইয়া রহিয়াছে তাহারা এমন পাগলের কথা বুঝিবে কিরূপে?

বাঙ্গালাভাষা ভাল করিয়া শিখিবেন ইহা তাঁহার বহুদিনের বাসনা ছিল। কিন্তু সময়ের অভাবে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়া শিখিতে পারেন নাই বলিয়া উহা ভাল

করিয়া আয়ত্ব করিতে তিনি কখন পারেন নাই। তথাপি এক একটী ছোট ছোট কথা যখন যাহার নিকট শিখিবার সুবিধা পাইতেন তখনই শিখিয়া লইতেন। ঐরূপ সময়ে একটী ছোট মেয়েও তাঁহার শিক্ষয়িত্রীর পদ প্রাপ্ত হইত, তাহার নিকটেও তাঁহার বিনীতা ছাত্রীর ন্যায় আচরণ দেখা যাইত। আবার একটী নূতন কথা শিখিতে পারিলে তিনি ক্ষুদ্র বালিকার মত আনন্দে অস্থির হইতেন। একদিন কোন মেয়ে শ্লেটে দাগ টানিতে টানিতে বলিয়াছিল "লাইন টানিতেছি।" "লাইন" এই শব্দটী শুনিবামাত্র নিবেদিতা তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন "আপনার ভাষায় বল।" কিন্তু "লাইন" এর বাঙ্গালা প্রতিশব্দটী যে কি তাহা ছোট মেয়েদের কেহই তখন ভাবিয়া পাইল না। সকলেই বলিতে লাগিল "সিষ্টার, আমরাতো বরাবরই লাইন বলি।" ঐকথা শুনিয়া দুঃখে বিরক্তিতে নিবেদিতার মুখ লাল হইয়া উঠিল, নিবেদিতা বলিলেন "তোমরা আপনার ভাষাও ভুলিয়া গেলে?" ঐ সময়ে একটী ছোট মেয়ে বলিয়া উঠিল, "লাইনের বাংলা

রেখা।" তখন আর নিবেদিতার আনন্দের সীমা রহিল না. তিনি যেন একটী হারাণ জিনিষ কুড়াইয়া পাইলেন এবং বার বার "রেখা, রেখা, রেখা", উচ্চারণ করিতে লাগিলেন।

নিবেদিতা যখন ছবি আঁকিতে শিখাইতেন তখন সকল মেয়েকে সারি দিয়া বসাইতেন, ছোট বড় কাহাকেও বাদ দিতেন না। শিক্ষয়িত্রীরাও সে সময় ছাত্রীদের শ্রেণীভুক্তা হইতেন। সিষ্টার ক্রিশ্চিয়ানাও ঐ সময়ে সকলকে উৎসাহিত করিবার জন্য কখন কখন ছাত্রীদলভুক্তা হইয়া বসিতেন। ক্রিশ্চিয়ানা ছোট মেয়েদের কাছে ঘেঁসিয়া বসিতেন এবং কখন কখন রঙ্গ করিয়া এমন ভাব দেখাইতেন যেন তাঁহার বড় ভয় হইতেছে, তাঁহার অঙ্কিত ছবি ভাল হইবে না। মেয়েরা তাহা দেখিয়া খুব হাসিত।

ছবি আঁকিবার কালে মেয়েরা প্রত্যেকে, রং তুলী পেন্সিল ও একখানা করিয়া কাগজ পাইত, নিবেদিতার নিজের হাতেও তুলি আর কাগজ থাকিত, সকলে ঐরূপ-ভাবে বসিলে প্রথমে তিনি প্রায়ই পেন্সিল দিয়া একটী

বৃত্ত আঁকিতেন, এবং ঐ কাগজখানি হাতে লইয়া কি রকম ভাবে হস্ত চালনা করিয়া বৃত্ত আঁকিতে হইবে প্রত্যেক মেয়ের কাছে দাঁড়াইয়া তাহা এক একবার দেখাইয়া দিতেন।

মেয়েরা প্রথমে পেন্সিলের উল্টাদিক দিয়া, কাগজে যাহাতে দাগ না পড়ে অথচ নিবেদিতা যে ভাবে দেখাই-লেন সেই ভাবে যতদূর পারে হস্তচালনা করিয়া কাগজের উপর বারম্বার পেন্সিল ঘুরাইতে শিখিত, তাহার পর দ্রুত-হস্তে বৃত্ত অঙ্কিত করিত। এইরূপে বৃত্ত হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে নানারূপ চিত্র তাহাদিগকে আঁকিতে শিখান হইত।

বিদ্যালয়টী যেন মেয়েদের একটী আনন্দ-নিকেতন ছিল। বিদ্যালয়ে যে সকল বড় মেয়েরা আসিত তাহাদের কেহই অবস্থাপন্ন গৃহস্থের বধূ বা কন্যা ছিল না, এজন্য সংসারের কাজ শেষ করিয়া তাহাদের বিদ্যা-লয়ে আসিতে হইত। স্কুলে আসিবার উৎসাহে মেয়েরা সকাল হইতে প্রাণপণে সংসারের ঐসকল কাজ শেষ করিত। মাঝে মাঝে ছাত্রীদের দক্ষিণেশ্বর কালীবাটী

অথবা কলিকাতার অন্য কোন স্থানে বেড়াইতে লইয়া যাওয়া হইত, সে সময় সিষ্টারেরা ছাত্রীদিগকে যথাসম্ভব আতিথ্যদানও করিতেন। গ্রীষ্মাবকাশ প্রভৃতি দিবার সময়ে বিদায়গ্রহণকালেও মেয়েদের খাবার খাওয়াইতেন। ছাত্রীর সংখ্যা বড় কম ছিল না, তাহার উপর নিজেও দরিদ্র, কাজেই অপর্য্যাপ্ত সামগ্রী যোগাড় করিতে কেমন করিয়া পারিবেন? সেজন্য পূর্ব্ব হইতে ছাত্রীর সংখ্যা গণনা করিয়া ফলমিষ্টান্নাদি আনাইয়া প্রত্যেকের জন্য ছোট ছোট একটী করিয়া সুন্দর শালপাতার ঠোঙ্গা গড়িয়া তাহার ভিতর ঐ খাবার সাজাইতেন। পরে ঐ ঠোঙ্গাগুলি একটী ঝোড়ায় তুলিয়া ঝুড়ি হাতে একে একে সকলকে পরিবেষণ করিতেন। আবার খাওয়া শেষ হইলে মেয়েরা ঠোঙ্গা ফেলিবে বলিয়া নিজেই ঝুড়ি হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন।—এইরূপে তিনি তাঁহার ক্ষুদ্র অতিথিগণের সেবা সমাধা করিতেন।

পুরী ভুবনেশ্বরাদি তীর্থে মেয়েদের বেড়াইতে লইয়া যাইতে তাঁহার মাঝে মাঝে অত্যন্ত ইচ্ছা হইত; অনেক

বার যাইবার প্রস্তাবও করিয়াছিলেন কিন্তু অর্থাভাববশতঃ উহা ঘটিয়া উঠে নাই। নিবেদিতা দেশ-ভ্রমণের এবং তীর্থ-ভ্রমণের অতিশয় পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি নিজে ভারত-বর্ষের সকল তীর্থই প্রায় ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং সময়ে সময়ে ঐ সকল স্থানের ভ্রমণ কাহিনী মেয়েদের নিকট গল্প করিতেন। তিনি সুদূর বদরিকাশ্রমে গিয়াছিলেন, মেয়েদের নিকট যখন তাঁহার বদরিকা-যাত্রার কাহিনী বর্ণনা করিতেন তখন মনে হইত যেন এইমাত্র তিনি ঐস্থান দেখিয়া ফিরিয়াছেন ও বলিতেছেন। ঐ সময় পথে অলকানন্দা নদীতীরে তিনি এক বৃদ্ধাকে দেখিয়াছিলেন, তাঁহার কথা মেয়েদের কাছে এইভাবে বলিতেন—"তিনি (সেই বৃদ্ধা) স্নান করিয়া উঠিয়াছেন, তখনও ভিজা কাপড় পরিয়া আছেন। তিনি বৃদ্ধা হইয়াছেন, তাঁহার মাথার চুল সাদা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তিনি শীতকে গ্রাহ্য করেন না। অলকানন্দা নদীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া যোড়হাতে (বলিতে বলিতে নিবেদিতা হাতযোড় করিলেন) সূর্য্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া তিনি প্রণাম করিতেছেন। কি সুন্দর! কি সুন্দর

তাঁহার মুখ। আমি আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।" বদরিকার পথে আর এক স্থানে একজন প্রাচীনার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁহার সম্বন্ধে নিবেদিতা এইবার বলিতে লাগিলেন—"তুষার গলিয়া গিয়াছে, পিছলে তাঁহার পা সরিয়া যাইতেছে। আমার ভয় হইল, তিনি পড়িয়া যাইবেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি কি আমার সাহায্য গ্রহণ করিবেন? আমি তাঁহার বাহু ধরিতে পারি কি?—আমি তাঁহার নিকট ঐরূপে অনুমতি প্রার্থনা করিলাম। তিনি আমার দিকে চাহিয়া হাসিলেন—আঃ কি সুন্দর সে হাসি!—এবং আপনার যষ্টির উপর ভর দিয়া চলিয়া গেলেন।" "তিনি কি আমার সাহায্য গ্রহণ করিবেন?"—এই কথাগুলি নিবেদিতা এমন করিয়া বলিতেন যে বেদনার মত আমাদের হৃদয়ে আঘাত করিত!

নিবেদিতা যখন দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে যাইতেন তখন কত দীন হীন ভাবেই প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া থাকিতেন। কারণ তিনি জানিতেন, মন্দিরে উঠিয়া দেবীদর্শন করি-

বার অধিকার তাঁহার নাই। কিন্তু হায়, মন্দিরে যাঁহারা দেবীর পূজা করিতেন তাঁহাদের মধ্যেও নিবেদিতার মত অধিকারী কয়জন ছিল, বলিতে পারি না! যাঁহার চরণধূলি স্পর্শে লোক পবিত্র হয়, দেখিয়াছি, আমাদের কাহারও কাহারও বাটীতে যাইয়াও তিনি ঐরূপে তাঁহার স্পর্শে পাছে কোন জিনিস দূষিত হয় ভাবিয়া সর্ব্বদা সঙ্কুচিতা হইতেন! যে সর্ব্বত্যাগিনী, গৃহ, সমাজ, সামাজিক সম্মান আত্মীয় স্বজনের দুশ্ছেদ্য স্নেহপাশ সকলই পরিহার করিয়া ভারতের কল্যাণে নিঃশেষে আপনাকে সমর্পণ করিয়াছিলেন, হে ভারতবাসী, তুমি কি তাঁহাকে আপনার গৃহে, পরিবারে, হৃদয়ে গ্রহণ করিয়াছিলে? তাহা যদি করিতে তবে এত শীঘ্র হয়ত আমরা তাঁহাকে হারাইতাম না।

বদরিকার তুষার-পিচ্ছিল-পথে প্রাচীনা রমণী যে নিবেদিতার সাহায্য করিবার জন্য সাগ্রহ প্রার্থনা উপেক্ষা করিয়া ঈষৎ হাসিয়া আপনার যষ্টির উপর ভর দিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন নিবেদিতা তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষুব্ধা বা দুঃখিতা না হইয়া বরং আনন্দিতাই হইয়াছিলেন।

নিবেদিতা ঐ সম্বন্ধে যে ভাবে " কি সুন্দর সে হাসি !" কথাগুলি বলিতেন—তাহাতেই উহা স্পষ্ট বুঝা যাইত। বুঝা যাইত, ক্ষুদ্র বালিকা তাহার জননীকে সাহায্য করিতে চাহিলে মা যেমন মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া হাসেন কিন্তু সে হাসিতে উপেক্ষা প্রকাশ না পাইয়া বরং অক্ষম চেষ্টার প্রতি স্নেহ ও আত্মনির্ভরের ভাবই প্রকাশ পায়, প্রাচীনার ঐ হাসিতে নিবেদিতা সেই ভাবই দেখিতে পাইয়াছিলেন।

আত্মনির্ভরের ভাবটী নিবেদিতার বড় শ্রদ্ধার সামগ্রী ছিল। নিবেদিতা উহাকে ভারতবর্ষের বংশগত ভাব বা ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। "তিনি ভারতবাসী" —নিবেদিতা এই কথাগুলি অতি সম্ভ্রমের সহিত উচ্চারণ করিতেন। শুনিয়াছি নিবেদিতার কাছে যে গোয়ালা দুধ দিত, সে একদিন তাঁহার নিকট ধর্ম্মসম্বন্ধে কিছু উপদেশ চাহিয়াছিল। নিবেদিতা তাহার কথা শুনিয়া নিতান্ত সঙ্কুচিতা হইলেন, এবং আপনাকে অপরাধী মনে করিয়া বার বার তাহাকে নমস্কার করিয়া বলিলেন, "তুমি ভারতবাসী, তুমি আমার নিকট কি উপদেশ চাও ?

তোমরা কি না জান? তুমি শ্রীকৃষ্ণের জাতি, তোমাকে আমি নমস্কার করি।"

মেয়েদের কখন কখন তিনি যাদুঘর (Museum) দেখাইতে লইয়া যাইতেন। মিউজিয়ামের যে সকল গৃহে ভারতের প্রাচীনকালের স্থাপত্যের নিদর্শন সমূহ রক্ষিত আছে সেই সকল গৃহ ভাল করিয়া দেখাইতেন। বৌদ্ধ-যুগের ভাস্করনির্ম্মিত প্রস্তরময় মূর্ত্তি ও স্তম্ভ প্রভৃতি যে গৃহে আছে একদিন সেই গৃহে মেয়েদের লইয়া বেড়াইতে বেড়াইতে নিবেদিতা একখানি শিলালিপির নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন, দাঁড়াইয়া মেয়েদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন "এই প্রস্তরের নাম 'কাম্য প্রস্তর', মহারাজ অশোক এই প্রস্তরের নিকট বসিয়া কামনা করিয়াছিলেন, এসো আমরাও সকলে এখানে বসিয়া কামনা করি।" বলিয়া সেই প্রস্তরমূলে মেয়েদের সকলকে লইয়া উপবেশন করিলেন এবং "তোমরা সকলেই মনে মনে কামনা কর" বলিয়া নিজে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। পরে মেয়েদের জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা কি কামনা করিয়াছিলে?" মেয়েরা তাহাতে উত্তর দিতে ইতস্ততঃ

করিতেছে দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন "ঠিক, কাম্য মন্ত্র মনেই রাখিতে হয়, বলিতে নাই।"

ধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি কখনও কাহারো সহিত আলোচনা অথবা তর্ক বিতর্ক করিতেন না, কিন্তু তাঁহার সমগ্র জীবনই একখানি জীবন্ত ধর্ম্মশাস্ত্র বলা যাইতে পারে। তাঁহার হৃদয়ে যে প্রবল আধ্যাত্মিকতার পিপাসা ছিল সে পিপাসা কলসীর জলে পূর্ণ হইবার নহে। তিনি যে দেশে ও সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সেখানে রমণীর স্বাধীনতা অব্যাহত, সমাজে তাঁহাদের উচ্চসম্মান, জীবনে সকল বিষয়েই ইচ্ছামত পথ নির্ণয় করিয়া লইবার অধিকার তাঁহাদের আছে, নিবেদিতাও নিজের জীবনলক্ষ্য নিজেই স্থির করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার যেরূপ বিদ্যাবুদ্ধি ও অনন্যসাধারণ প্রতিভা ছিল তাহাতে পাশ্চাত্য সমাজ তাঁহাকে যে, রমণীকুলের বরেণ্যা ও শীর্ষস্থানীয়া বলিয়া গ্রহণ করিত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তথাপি নিবেদিতা জীবনের সেই পুষ্পাস্তীর্ণ পথ পরিত্যাগ করিয়া এমন এক দুর্গম পথে চলিয়াছিলেন যে লোকে তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে নিবেদিতার এই আজীবন তপস্যাকে সতীর তপস্যার সহিত তুলনা করিয়াছেন। বাস্তবিকই নিবেদিতা মূর্ত্তিমতী তপস্যারূপিণী ছিলেন। তপস্যা ও তাঁহার জীবন মিলিয়া মিশিয়া যেন এক হইয়া গিয়াছিল। তপঃসমুদ্রের তীরে বসিয়া অঞ্জলি বারিপানে তাঁহার তৃষ্ণা দূর হয় নাই, তিনি সেই সমুদ্রে একেবারে ডুবিয়া গিয়াছিলেন!—অথবা শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় যেমন বলিয়াছেন, তাঁহার চিত্ত "ভাবৈকরস" হইয়া পরম কল্যাণে স্থিত হইয়াছিল।

মানবসমাজের ভাবই প্রাণস্বরূপ; ভাবহীন সমাজ মৃতপ্রায়। কর্ত্তব্যের পাষাণমূর্ত্তিতে ভাবই প্রাণদান করে। ভাবের তরঙ্গমালাই কর্ম্মপ্রবাহে নির্ম্মল-স্রোতা স্রোতস্বিনীর প্রাণময়ী গতি আনিয়া দেয়। নিবেদিতা যাহা করিতেন তাহা কেবল মাত্র কর্ত্তব্যবুদ্ধিতেই করিতেন না, উহাতে হৃদয়ের ভালবাসা ঢালিয়া দিতেন। কর্ত্তব্যবুদ্ধি অনুষ্ঠিত কার্য্য হইতে আপনাকে পৃথক্ করিয়া রাখে, ভালবাসা ঐ কর্ম্মের মধ্যে আপনাকে মিশাইয়া হারাইয়া

ফেলে। কর্ত্তব্যের দান—দীনের প্রতি দয়া, ভালবাসার দান—পরমাত্মীয়ের ন্যায় তাহার কল্যাণে জীবন সমর্পণ। তাই বলিতেছি, নিবেদিতা ভালবাসিয়া ভারতবর্ষকে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, কেবল মাত্র কর্ত্তব্যবোধে করেন নাই।

নিবেদিতা কোন কোন দিন মেয়েদের নিকট তাঁহার গুরুদেবের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিতেন। কিন্তু তাঁহার নাম মাত্র উল্লেখে নিবেদিতার অন্তর ভাবরসে এতই পরিপূর্ণ হইত যে অধিক কথা বলা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিত। তাঁহার গুরুদেবের সম্বন্ধে এই কথাটী কিন্তু আমরা তাঁহাকে বারবার বলিতে শুনিয়াছি—"তাঁহার নাম বীরেশ্বর, তিনি বীরদিগের ঈশ্বর ছিলেন। পৃথিবীর বীরগণ তাঁহার পদানুসরণ করিয়া চলিবে। তোমরা সকলে ছোট ছোট সুখ দুঃখ ছাড়িয়া বীর হও।" "বীর" কথাটী তিনি সব সময়ই পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জোর দিয়া বলিতেন।

মেয়েদের পড়িবার ঘরে ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের একখানি চিত্র ছিল। অপর দিকের দেওয়ালে একখানি পৃথিবীর মানচিত্র টাঙ্গানো থাকিত। নিবেদিতা এক

দিন ঐ মানচিত্রখানি আনিয়া পরমহংসদেবের ছবির নীচে টাঙ্গাইয়া দিয়া মেয়েদের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিয়াছিলেন "রামকৃষ্ণদেব জগৎগুরু ছিলেন, জগতের মানচিত্র তাঁহার পদতলে থাকাই উচিত।" কথাটি নিবেদিতার প্রাণের কথা। তিনি যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন তাহা ঐরূপে জগৎসমক্ষে মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করিতে কখন কুণ্ঠিত হন নাই। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছিলেন "মুক্ত হবে কবে, আমি যাবে যবে; আমি মলে ঘুচয়ে জঞ্জাল"—অর্থাৎ আপনাকে ঈশ্বরে একেবারে লয় করিয়া না দিলে আধ্যাত্মিক জগতে কেহ কখন জন্মলাভ করিতে পারে না। হিন্দুর বেদ ঐ জন্যই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষকে—'দ্বিজ' নাম দিয়াছেন। 'দ্বিজ' অর্থাৎ যাঁহারা দুই বার জন্মিয়াছেন। নিবেদিতা নিশ্চয়ই ঐভাবে পুনর্জন্ম লাভ করিয়াছিলেন, তিনি অপার মহোদধিতে আপনার বিন্দুত্ব একেবারে লয় করিয়া দিয়াছিলেন। তাহা না হইলে নিবেদিতা যে ভাবে আত্মত্যাগ করিয়াছিলেন, তেমন অপার্থিব আত্মত্যাগ তাঁহাতে কখনও সম্ভবপর হইতে পারিত না। আত্মত্যাগের কাহিনী

নিবেদিতা।

আমরা লোকমুখে শুনিয়াছি, পুস্তকেও পড়িয়াছি, কিন্তু নিবেদিতার আত্মত্যাগ, যাহা চক্ষের সম্মুখে দেখিয়াছি, তাহা আর কোন স্থানে দেখিয়াছি অথবা দেখিব বলিয়া মনে হয় না।

নিজের নাম নিবেদিতা যখনই সাক্ষর করিতেন তখনই "Nivedita of Ramkrishna-Vivekananda" বলিয়া সাক্ষর করিতেন। যদিও বঙ্গানুবাদে উহার 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-মণ্ডলীভুক্তা নিবেদিতা, এই অর্থ হয়, তথাপি ঐ কথাগুলি ঐ একই প্রকার অর্থে তিনি প্রয়োগ করিতেন বলিয়া বোধ হয় না। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দরূপ যুক্তনামের দ্বারা হয়ত তাঁহার মন গুরু ও ঈশ্বর অভেদ এই কথাই স্মরণ করিত। বর্ত্তমানকালের উদারমতাবলম্বীগণ সম্প্রদায়ের গণ্ডিকে অত্যন্ত ঘৃণা করিয়া থাকেন, নিবেদিতা কিন্তু সর্ব্বদাই পূর্ব্বোক্তভাবে বিশেষ এক সম্প্রদায়ের নামের সহিত আপনার নাম যুক্ত করিয়া রাখিতেন, অথচ তাঁহার মত উদার মত অতি অল্পলোকেরই দেখা যায়! এ প্রহেলিকার কে উত্তর দিবে? তবে সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামী এবং একনিষ্ঠতা যে

দুইটি পৃথক পদার্থ এবং উভয়ের মধ্যে যে আকাশ পাতাল প্রভেদ আছে, একথা সত্য। একটীতে আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং অপরটিতে আত্মবিসর্জ্জনরূপ উদ্দেশ্য যে রহিয়াছে একথা স্পষ্ট। জগতে কেন্দ্রানুগ গতির সহিত কেন্দ্রাতীগ গতির যেমন অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ, সেইরূপ একনিষ্ঠার সহিত অনন্তে আত্মব্যাপ্তির অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ বিদ্যমান। নিবে-দিতার জীবন ঐ একনিষ্ঠতারই একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। নিবেদিতা যে পথ ধরিয়া চলিয়াছিলেন সে পথের কঠোরতা ও সিদ্ধি বিলম্বন তাঁহার নির্ম্মল হৃদয়-আকাশে কখনও বিন্দুমাত্র সংশয়মেঘের সঞ্চার করিতে পারে নাই। কেবলমাত্র ধ্রুবতারাকেই লক্ষ্য করিয়া তিনি নিঃসংশয়ে আপন পথে নিয়ত চলিয়া গিয়াছেন! পূর্ণচন্দ্রের মধুর জ্যোৎস্নায় তাঁহার চিত্ত মধুময় হইয়া গিয়াছিল বলিয়াই তিনি মাতৃরূপে সকলকেই নির্বিশেষে বুকে ধরিয়া গিয়া-ছেন! তাঁহার ভালবাসা সম্পূর্ণরূপে স্বার্থগন্ধ রহিত ছিল, এজন্যই উহা প্রতিদানের অপেক্ষা রাখিত না এবং অপ্রতিদানেও ম্লান না হইয়া সমভাবেই উজ্জ্বল থাকিত! ঐরূপ ভালবাসালাভেই মানব সর্ব্বপ্রকার ভোগসুখ-

লাভকেই তুচ্ছ ভাবিয়া দূরে পরিহার করিতে সমর্থ হয় এবং সংসারের সকলে যাহাকে গুরুতর দুঃখ বলিয়া ভয়চকিত নেত্রে দেখে, ঐরূপ দুঃখকেও স্বেচ্ছায় অম্লান-বদনে আলিঙ্গন করে!—

যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুনাপি বিচাল্যতে॥"গীতা"

অতএব "Nivedita of Ramkrishna-Vivekananda"—'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দে নিবেদিত নিবেদিতা'—যে ঐরূপ করণে সমর্থা হইয়াছিলেন তাহার কারণ তিনি যথার্থই সর্ব্বতোভাবে আপনাকে ঈশ্বরের শ্রীপাদপদ্মে নিবেদন করিয়াছিলেন। তাই বলিতেছি পার্থিব জগতে তিনি দুঃখ কষ্ট স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইয়াছিলেন বটে কিন্তু সংশয়-পীড়ায় তাঁহার চিত্ত কখনও পীড়িত হয় নাই। তাঁহার শেষ বাক্যও ঐ ভাবের পরিচায়ক,—"The boat is sinking, but I shall yet see the sun rise."

তিনি এমন ভাবময়ী ছিলেন যে অনেক সময় তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইত সদ্ভাবসমষ্টিই যেন মূর্ত্তি

পরিগ্রহ করিয়া ঐরূপে আমাদের সম্মুখে বিদ্যমান রহিয়াছে! তিনি কখন লোক-শিক্ষয়িত্রী, কখন স্নেহবিগলিতা জননী, কখন কর্ত্তব্যৈকনিষ্ঠ মায়ামমতাবর্জ্জিত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কর্ম্মী, কখন বিনীতা-ছাত্রী অথবা সেবিকা আবার কখনও ভগবৎভাবে বিভোরা রূপে প্রতীয়মানা হইতেন। বোসপাড়ার বাটীতে এইরূপে দুইটি ইয়ুরোপীয় মহিলা বৎসরের পর বৎসর বাস করিয়াছিলেন, ভগিনী নিবেদিতা ও ক্রিশ্চিয়ানা। ক্রিশ্চিয়ানার কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে অন্যত্র উল্লেখ করিয়াছি। নিবেদিতা-বিয়োগসন্তপ্তা তিনিই এখন উক্ত বিদ্যালয়ের গুরুভার নিজ স্কন্ধে বহন করিয়া একাকী দিন যাপন করিতেছেন। বাগবাজার উদ্বোধন কার্য্যালয়ে শ্রীশ্রীমাতাদেবী (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহধর্ম্মিণী) কখন কখন আসিয়া বাস করেন। ভগ্নী নিবেদিতা ও ক্রিশ্চিয়ানা দিনের মধ্যে একবারও অন্ততঃ তথায় গিয়া তাঁহার নিকট কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিতেন। নিতান্ত বালিকা যেমন মায়ের মুখের দিকে আনন্দে চাহিয়া থাকে, নিবেদিতাও ঐ সময়ে সেইরূপ ভাবে মাতাদেবীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকি-

তেন। ভগিনী নিবেদিতার ন্যায় তেজস্বিনী রমণী রমণী-কুলে দুর্ল্লভ, মাতাদেবীর নিকটে কিন্তু তাঁহার এইরূপ শিশুর মত ভাব ছিল। মাতাদেবী যখন তাঁহার দিকে সস্নেহহাস্যে চাহিতেন তখন মায়ের আদরে বালিকার মত তিনি একেবারে গলিয়া যাইতেন। মা যে আসনে বসিবেন, নিবেদিতা যেদিন সেই আসনখানি পাতিয়া দিবার অধিকার পাইতেন, সেদিন তাঁহার যে আনন্দ হইত তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে, সে আনন্দ তাঁহার মুখের দিকে ঐ সময়ে চাহিলেই কেবল বুঝা যাইত। পাতি-বার পূর্ব্বে আসনখানিকে তিনি বারম্বার প্রণাম করিতেন, এবং অতি যত্নে ধূলা ঝাড়িয়া পরে উহা পাতিতেন ; তাঁহার ভাব দেখিয়া তখন বোধ হইত মাতাদেবীর ঐটুকু সেবা করিতে পাইয়াই যেন তিনি তাঁহার জীবন সার্থক-জ্ঞান করিতেছেন।

মাতাদেবী একদিন বিদ্যালয় দেখিতে আসিবেন, স্থির হইয়াছিল ঐ কথা শুনিয়া অবধি নিবেদিতার কার্য্যের ও আনন্দের যেন আর বিরাম নাই! বিদ্যালয়ের সমস্ত ঘরগুলি ঝাড়াইয়া ঝুড়াইয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন

করিয়া ফেলিলেন, পত্র পুষ্প আনাইয়া ঘরদ্বারে টাঙ্গা-ইয়া শোভাবর্দ্ধন করিলেন, মাতাদেবী কোথায় বসিয়া মেয়েদের সহিত আলাপ করিবেন, মেয়েরা তাঁহাকে কি উপহার দিবে, কি শুনাইবে ইত্যাদি সকল বিষয় স্থির করিতে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। তাহার পর মা যেদিন বিদ্যালয়ে আসিবেন নিবেদিতা সে দিন যেন আনন্দে একেবারে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়াছেন! সকল বস্তু যথাস্থানে আছে কিনা দেখিতে এখানে ওখানে ছুটাছুটী করিতেছেন, হাসিতেছেন, আবার কখনও বা আনন্দে অধীরা হইয়া বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীদিগের এবং কখন বা দাসীর পর্য্যন্ত গলা জড়াইয়া আদর করিতে-ছেন!

শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রভৃতি নয়জন নির্ব্বাসিত ব্যক্তি যে দিন মুক্তিলাভ করিলেন সে দিনও নিবে-দিতার এইরূপ আনন্দ দেখিয়াছিলাম। সে দিনও বিদ্যালয়ের দ্বারে পূর্ণকুম্ভ স্থাপিত ও কদলীবৃক্ষ রোপিত হইয়াছিল। সে দিনও আনন্দের দিন বলিয়া মেয়েদের অনধ্যায় হইয়াছিল।

নিবেদিতা।

অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে নিবেদিতা দৃপ্তাসিংহীর মত উত্তেজিতা হইয়া উঠিতেন। সে সময় তিনি জগতে কাহাকেও দৃক্‌পাত করিতেন না। তাঁহার রোষাগ্নিদীপ্ত দৃষ্টির সম্মুখে অতি গর্ব্বিতকেও মস্তক অবনত করিতে হইত। অপর দিকে তাঁহার নম্রতাও আবার অনন্যদুর্লভ ছিল, সে নম্রতা মৌখিক বিনয় নহে, কিন্তু সম্পূর্ণ আন্তরিক সৌজন্যতাপ্রসূত ছিল। তিনি অতি দরিদ্রের সহিতও যেরূপ সসম্ভ্রমে ব্যবহার করিতেন সেরূপ ব্যবহার কেবল তাঁহাতেই সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়।

তাঁহার প্রকৃতির মধ্যে একটী সদাজাগ্রতভাব ছিল, সেইটীকে তাঁহার যোদ্ধৃভাবও বলা যাইতে পারে। এক-দিকে তিনি যাহা বুঝিতেন তাহার ভিতর যেমন তিল-মাত্র জটিলতা, বা সংশয়ের সম্পর্ক রাখিতেন না, তেমনি আবার অন্যদিকে যাহা বুঝিয়াছেন তাহা সফল করিবার জন্য জীবনের প্রতিক্ষণ যোদ্ধা যেমন যুদ্ধের জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকে সেইরূপভাবে তিনি সমগ্র অন্তরের সহিত সদা জাগ্রত থাকিতেন। সেই জন্য তাঁহার কথায় ও কাজে বিন্দুমাত্র গরমিল দেখা যাইত না। মনুষ্যত্বের উপর

শ্রদ্ধা নিবেদিতার স্বভাবের ধাতুগত ধর্ম্ম ছিল। মানুষ যথার্থ মনুষ্যত্বে ভূষিত হউক ইহাই তিনি চাহিতেন। মানুষের ভিতরে যেখানে যে ভাবেই মনুষ্যত্বের বিকাশ দেখিয়াছেন, তেজস্বিনী নিবেদিতা সেইখানেই শ্রদ্ধা-সহকারে আপনার মস্তক নত করিয়াছেন।

নিবেদিতার জীবন আলোচনা করিতে গেলে এত কথা বলিবার আসিয়া উপস্থিত হয় যে তাহা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে এবং লেখিকার সামর্থ্যেও কুলায় না। তাঁহার পরিচয় তিনি যে সকল পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন তাহার ভিতর অনেকাংশে পাওয়া যায় বটে কিন্তু তাঁহার সম্পূর্ণ পরিচয় পাইতে হইলে যে ভালবাসা দিয়া তিনি ভারতকে আপনার করিয়া লইয়াছিলেন সেই ভালবাসা দিয়াই তাঁহাকে বুঝিতে হইবে।

আজ নিবেদিতার কথা বলিতে গিয়া একদিকে যেমন সেই দৃঢ়ব্রতা সন্ন্যাসিনীর সত্য, ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও প্রেমপূত চরিত্র স্মরণ করিয়া বিমল আনন্দে চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, তেমনি অপর দিকে আবার আপনাদিগের অপৌরুষ ও দৈন্য স্মরণ করিয়া ক্ষোভে

নিবেদিতা।

ও লজ্জায় অভিভূত হইতে হইতেছে। ভারতবর্ষের সৌভাগ্য যে নিবেদিতাকে পরমাত্মীয়ারূপে ধরিতে পাইয়াছিল। ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য যে নিবেদিতা যখন ইহ জগতে ছিলেন তখন তাঁহাকে আপনার বলিয়া বুঝিয়া হৃদয়ে গ্রহণ করিতে পারে নাই।

আজ আমরা নিবেদিতাকে হারাইয়াছি, আজ তাঁহার সেই আনন্দময়ী মূর্ত্তি লোক-লোচনের সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে, আজ বোসপাড়ার বিদ্যালয় ও গৃহ শূন্য, তিনি আর সেখানে নাই। কিন্তু তপস্বিনী নিবেদিতার আজীবন সাধনার জীবন্ত জ্বলন্ত মূর্ত্তি ও তাঁহার বিদ্যালয়রূপ সাধনক্ষেত্র এখনও সমভাবেই রহিয়াছে। নিবেদিতার প্রাণপাতী তপস্যাই যাহাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিল সেই বোসপাড়ার বিদ্যালয়টী এখনও তদ্রূপই রহিয়াছে। হে ভারতবাসী, নিবেদিতা-অভাবে তাহা কি শূন্যগর্ভে মিলাইয়া যাইবে? স্বামী বিবেকানন্দের সেই জলদগম্ভীর নির্ঘোষে আহ্বান-ধ্বনি, "জাগো জাগো মহা-প্রাণগণ, পৃথিবী দুঃখ ক্লেশে দগ্ধ হইতেছে, তোমার কি এখন নিদ্রা যাওয়া কর্ত্তব্য"—যে আহ্বানে নিবেদিতা

কেবলমাত্র ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করিয়াই সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড়াইয়াছিলেন সে আহ্বান কি তুমি এখনও শুনিবে না? ভারতে কি বিংশতি জনও এমন লোক নাই যাঁহারা ভগ্নী নিবেদিতার মানসী কন্যারূপী উক্ত বিদ্যালয়টীর রক্ষণে ভারতেরই কল্যাণ বুঝিয়া সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র ঈশ্বরকে আশ্রয় করিয়া ঐ কার্য্যের সহায়ক স্বরূপে দাঁড়াইতে পারেন?

ইহাও যদি না সম্ভবপর হয়, তবে আবার বলি ভারতবাসীর এতটুকুও কি প্রাণ নাই যে নিবেদিতা অনশন অর্দ্ধাশন স্বীকার করিয়া যাহাকে আজীবন রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা কেবলমাত্র অর্থ-ভিক্ষা দিয়া সেই বিদ্যালয়টীকে রক্ষা করেন? হায়, তপস্বিনী নিবেদিতা অনাহার অনিদ্রায় শিক্ষাসমিধে যে হোমানল প্রজ্জলিত করিয়া গিয়াছেন তাহার উজ্জ্বল শিখা কি সমস্ত ভারতবর্ষকে আলোকিত করিবে না?—হব্য অভাবে তাহা কি যজ্ঞারম্ভেই নির্ব্বাপিত হইবে?

সম্পূর্ণ।

পুস্তক।	সাধারণের পক্ষে।	উদ্বোধন-গ্রাহকের পক্ষে।
বাঙ্গালা রাজযোগ (৩য় সংস্করণ) যন্ত্রস্থ		
জ্ঞানযোগ (ঐ)	১৲	৸০
ভক্তিযোগ (৪র্থ সংস্করণ)	৷৵০	৷৵০
কর্ম্মযোগ (৩য় ঐ)	৸০	৷০
চিকাগো বক্তৃতা (২য় ঐ)	৷/০	৷০
ভাববার কথা (২য় ঐ)	৷৵০	৷০
পত্রাবলী, ১ম ভাগ, (২য় ঐ)	৷০	৷৵০
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য (৪র্থ সংস্করণ)	৷৷০	৷৵০
পরিব্রাজক (২য় সংস্করণ)	৸০	৷০
বীরবাণী (৩য় ,,)	৷০	৷০
ভারতে বিবেকানন্দ (২য় সংস্করণ)	২৲	১৸০
বর্ত্তমান ভারত (৩য় সংস্করণ)	৷০	৷০
মদীয় আচার্য্যদেব	৷৵০	৷০
পওহারী বাবা	৶০	৵০
ধর্ম্ম-বিজ্ঞান	১৲	৸০
ভক্তি-রহস্য	৷৷৵০	৷৷০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ (পকেট এডিশন) স্বামী ব্রহ্মানন্দ সঙ্কলিত মূল্য ৷০, গীতা শঙ্করভাষ্যানুবাদ, পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণানূদিত উত্তরার্দ্ধ ১৷০, পাণিনীয় মহাভাষ্য পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী অনূদিত মূল্য ৩৷৷০ টাকা।

স্বামী সারদানন্দ প্রণীত ভারতে শক্তি-পূজা ৷৷০ আনা, উদ্বোধন-গ্রাহকের পক্ষে ৷৵০ আনা, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব—পূর্ব্বার্দ্ধ ১৷০, উদ্বোধন-গ্রাহকগণের পক্ষে ১৲। উত্তরার্দ্ধ ১৷০, উদ্বোধনের গ্রাহকের পক্ষে ১৵০। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ ২৲টাকা।

এতদ্ব্যতীত মঠের যাবতীয় গ্রন্থ এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ও স্বামী বিবেকানন্দের নানা রকমের ফটো এবং হাফ্‌টোন্ ছবি সর্ব্বদা পাওয়া যায়।

ঠিকানা—

উদ্বোধন কার্য্যালয়।

১২, ১৩ নং গোপালচন্দ্র নিয়োগীর লেন,

বাগবাজার কলিকাতা।